প্রাসঙ্গিক ভাবনা-বৈরাম খাঁ

একটি করুণ পরিণতি ও কিছু কথা

গত ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর ২৯ বছর পূর্তি হয়েছে। ষোড়স লুই-এর পর সম্ভবতঃ দুনিয়ার কোনও দেশের কোনও শাসক এভাবে মৃত্যুবরণ করেননি। উভয়ে ছিলেন দেশবাসীর রুদ্র রোষের শিকার।

সেদিনের স্মৃতি ভোলার নয়। ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ সাল। রাত ১১টায় ভয়েস অব আমেরিকার সর্বশেষ নিউজ বুলেটিন শুনে শুয়ে পড়েছিলাম। এই বুলেটিনে একটা খবর ছিল, যা কৌতূহল-উদ্দীপক ও অনেকটা অবিশ্বাস্য প্রকৃতির। রামগতির তোরাবগঞ্জে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়েছে। এটাই ছিল খবর। ভারতীয় বাহিনীর হেলিকপ্টার বাংলাদেশে কেন আসবে এবং তাদের সাথে এত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সেটা কেনই বা ভূপাতিত করা হবে, এসব বিক্ষিপ্ত চিন্তা সেদিন রাতের ঘুমকে আমার বিলম্বিত করেছে। অনেক দিন ধরেই ঐ সময় একটা গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ডিসব্যান্ড করে ভারতীয় বাহিনীর আগরতলা কম্যান্ডের উপর বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছেন। রক্ষী বাহিনীর উপর থাকবে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব। ঘুম দেরিতে আসায় পর দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠতেও দেরি হয়েছিল। আমি তখন নোয়াখালীর একটি থানা শহরে থাকি। দোতলা বাসা, নিচে দারোয়ান এবং বাবুর্চি, উপরে আমরা স্বামী-স্ত্রী ও আমার দু'বছর বয়সী বড় মেয়ে থাকতাম। সকাল ৭টার দিকে দোতলার বারান্দায় এসে প্রথমেই দেখলাম, আমার একজন ঘনিষ্ট বন্ধু ঐ থানার সার্কেল অফিসার সুলতান সাব দৌঁড়ায়ে আমার বাসার দিকে আসছেন। দূর থেকেই তাকে খুবই খুশি মনে হচ্ছিল। আমাকে লক্ষ্য করে অনেকটা চিৎকার করে বললেন, "আপনি এখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন?" আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। দারোয়ানকে ডেকে গেট খুলতে বলে আমি নিচে নেমে আসলাম। সিও সাব এসে ডুকলেন এবং একটা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে বললেন, "সে মারা গেছে এবং এখন থেকে তিনি আল্লাহ উপর ঈমান এনেছেন। আমাকে অনুরোধ করে বললেন, আমি যেন জুমার নামাযে যাবার সময় তাকে নিয়ে যাই। আমি তার ভাষা বুঝতে না পেরে পরিষ্কারভাবে কে মারা গেছে তা বলার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমার তুলনায় বেশ বয়স্ক মানুষ ছিলেন। তবে দীর্ঘ জীবনের লালিত বিশ্বাস ভঙ্গ করে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের কারণও জানতে চাইলাম। তিনি রেডিও অন করতে বললেন। তখন বার বার রেডিওতে ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল, "খুনী মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।" বিষয়টা তখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সিও সাব বললেন, "মানুষের উপর এত অত্যাচার-অবিচার, এত দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতিপক্ষকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া প্রভৃতি দেখা সত্ত্বেও শেখ মুজিব ও তার দলের লোকদের কোনো প্রকার গায়েবী শাস্তি ভোগ করতে না দেখে আমি আল্লাহর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে ছিলাম। এখন তার পরিণতি দেখে আমার সে আস্থা ফিরে এসেছে।" যে কোন মৃত্যুই করুণ। তার এই মৃত্যুতে একজন সরকারী কর্মকর্তার এই মন্তব্য কোন করুণ অবস্থার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে, তা সহজে অনুমেয়। কয়েক দিন আগে পুলিশ-সন্ত্রাসী গোলাগুলিতে নিহত দেশের একজন শীর্ষ সন্ত্রাসীর লাশের উপর কিছু লোককে বন্য প্রতিশোধ নিতে দেখা গেছে। শেখ মুজিবের মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ আমার কাছে ঐ ধরনের একটা ঘটনার মতই পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল বলে আমার মনে হয়। সেদিন নাস্তা না করেই সিও সুলতান সাবের সাথে বেরিয়ে পড়েছিলাম শহর, গ্রাম ও রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখার জন্য। আমি ঈদের আনন্দ দেখেছি। খ্রিস্টানদের বড় দিনের উল্লাস দেখেছি। হিন্দুদের দুর্গা পূজার উচ্ছ্বাস দেখেছি। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শেখ মুজিবের মৃত্যুতে মানুষের মুখে যে হাসি দেখেছি তা ছিল অতুলনীয়। একটা মানুষকে ইন্নালিল্লাহ পড়তে কিংবা তার জন্য আফসোস করতে দেখিনি। রবার্ট ব্রাউনিং-এর Patriot কবিতার কয়েক পংক্তি তখন আমার মনে পড়লো ঃ

"It was roses roses all the way
with myrtle mixed in my path like mad;
The house roof seemed to heave and sway
The church-spires flamed, such flags they had
A year ago on this very day.
.....
.....
There's on body on the house tops now
Just a palsied few at the windows set
For the best of the sight is all allow
At the shambles gate or better yet
By the very scaffold's fool, I trow

I go in the rain and more than needs
A rope cats both my wrists behind
And I think, by the feel, my forehead bleeds
For they fling, whoever has a mind
Stones at me for my yedrs misdeeds
Thus I entered and thus I go."

উপ-সম্পাদকীয়

ব্রাউনিং-এর PatriotPT এক বছর আগে মানুষ ফুল দিয়ে বরণ করেছিল। কিন্তু এক বছরের দুষ্কর্মে অতীষ্ঠ মানুষ জুতা আর পাথর মেরে তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। অনুরূপভাবে শেখ মুজিব বাংলার মানুষের যে ভালবাসা পেয়েছেন, দুনিয়ার কোনো নেতা তা পেয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই। কিন্তু সাড়ে তিন বছরের তার দুষ্কৃতি মানুষের এই মমতা ও ভালবাসাকে এত গভীর ঘৃণায় রূপান্তরিত করেছিল যে, তার করুণ পরিণতিতে প্রকাশ্যে আফসোস করার একটা লোক পাওয়া যায়নি। ব্রাউনিং-এর PatriotPT জীবিত রাখা হয়েছিল এবং তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন; কিন্তু শেখ মুজিব সে সুযোগ পাননি, দু'জনের মধ্যে তফাৎ এখানে। কেন এমন হলো?

প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৩৮০ বাংলার ২৭ চৈত্র তারিখে "রামপুর কুকরাইলে কি দেখেছি" শীর্ষক একটি উপসম্পাদকীয়তে দৈনিক জনপদ পত্রিকায় লিখেছেন, "..... গত ৭ এপ্রিল রবিবার টাঙ্গাইল শহর থেকে মাত্র পনরে মাইল দূরে অবস্থিত কালিহাতি থানার রামপুর ও কুকরাইল গ্রাম দেখতে গিয়ে মনে হলো, আমরা বড় বেশি আশা করেছিলাম। ক্ষমতা যারা হাতে পেয়েছেন তারা তা ব্যবহার করতে শেখেননি। তাই অপব্যবহারের মাত্রা বেড়েছে। পুরনো শাসকদের পরিত্যক্ত প্রশাসনিক যন্ত্র আর গদি নিজেদের দখলে পেয়ে তারাও পুরনো কায়দায় ক্ষমতা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। ভাবছেন, এটাই বুঝি নিয়ম। ব্যবহার না জানলে অপব্যবহারটাও কেউ দক্ষতার সাথে করতে জানে না। এখন ক্ষমতার নির্যাতন তাই আরো মাত্রাহীন.....।"

একটা সমৃদ্ধ জাতি কিভাবে ভিক্ষুকে পরিণত হয় শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে মানুষ তা দেখেছে। লাশের মিছিল আমি দেখেছি। আমি দেখেছি বারো আনা সেরের চাল তিন বছরের মাথায় কিভাবে ১২ টাকা, চার আনার লবণ ৮০ টাকা, আড়াই টাকার কটু তেল ৯০ টাকা, পাঁচসিকা দামের শুকনা মরিচ ২৫০ টাকা এবং চোদ্দ আনা দামের চিনি ২৩ টাকায় উঠে। ক্ষুধার জ্বালায় বাংলার মানুষ বমি খেতে আমি দেখেছি। বস্ত্রের অভাবে কলা পাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে মানুষ আর বাসন্তি তার যৌবন ঢেকেছে ছেঁড়া জাল দিয়ে। এর পাশাপাশি আওয়ামীলীগ নেতাদের চোরাচালান, মওজুতদারী, রিলিফ ও লঙ্গর খানার সামগ্রী আত্মসাৎ, লাইসেন্স পারমিটবাজী করে কোটিপতি হবার নযিরও মানুষ দেখেছে। অনাহারে মৃত লাশের উপর দিয়ে তারা বিত্তের বৈভব গড়ে তুলেছিল। মাওলানা ভাসানীর ভাষায়, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে তারা একটা লুটপাট সমিতিতে পরিণত করেছিলেন।

১৯৭৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাকের 'স্থান কাল পাত্র' শিরোনামের উপসম্পাদকীয়টিতে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ব্যবধানকে বঞ্চনার ব্যঞ্জনায় রূপ দেয়া হয়েছে এভাবে, "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই। যাহা পাই তাহা চাই না। বিষ ফল রোপণ করে তা থেকে অমৃত আশা করার মতো বেওকুফী আর কি হতে পারে। আমি কি তাহলে সেই বেওকুফ? আমি জানি না।

....অবশ্য আমি এখনো হিরো। তবে, সে হিরোর বীরত্ব জীবন থেকে পলায়নপরতায় সীমাবদ্ধ। মন্ত্রী-মিনিস্টারদের বক্তব্য অনুসারে নিজেকে কোনও বিশেষ পছন্দীয় সদস্য মনে করে ক্রেতা প্রতিরোধের মহড়া দিতে যাই। দোকানদার ব্যাঙের হাসি হাসে। শ্লেষের সাথে কথা ছুঁড়ে দেয়– নিলেও ওই দরেই নিতে হবে, না নিলে পথ দেখেন। ... আজ কয়েকদিন ধরে এক কৌটা ডানো খুঁজে ফিরছি। পাই না। পাঁচ পাউন্ডের ডানো খোলা বাজারে ১২০ টাকার উপরে। বন্ধু বলেন, টাকা দিয়ে দাও, কয়ডজন চাও এনে দিচ্ছি। আমি টাকা দিতে পারি না। ডানো আমার নিকট দিল্লীর লাড্ডুর মত মনে হয়।"

হ্যাঁ শিশু খাদ্য তখন দিল্লীর লাড্ডুই ছিল। আমার মনে আছে। দৈনিক অবজার্ভারের হাতিয়া সংবাদদাতা জনাব নূরুল ইসলাম (অনেকে তাকে রোড ম্যাজিস্ট্রেট বলতেন) একদিন রাত তিনটার সময় আমার বাসায় নাতিনের জন্য 'ডানো' 'ভিক্ষা' করতে এসেছিলেন। পুত্রবধূ অসুস্থ, ক্ষুধার জ্বালায় বাচ্চাটাকে সামলাতে না পেরে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে ছিলেন। মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানীদের তখনকার অবস্থা একটু চিন্তা করুন।

দুর্ভিক্ষ তো চলছিলই । খাদ্য মূল্যে অতিষ্ঠ সারা বাংলাদেশ। ২৪ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাকের মঞ্চে নেপথ্যে কলামে এর একটা অনুরণন দেখুন, "খাদ্য মূল্যের পাগলা ঘোড়া এখন কদমে নয় বরং চার পায়ে লাফাইয়া চলিতেছে। এক সহযোগী খবর দিয়েছেন যে, ঝালকাঠিতে চালের দাম গত দু'দিনের মধ্যে দু'শ সত্তর আশি টাকা হইতে বাড়িয়া তিনশত টাকায় উঠে এবং তারপরই বাজার হইতে চাল উধাও হইয়া যায়। আরেক সহযোগীর খবর নেত্রকোনায় চালের দর সাড়ে তিন শত টাকা। ভাবিয়া ছিলাম নেত্রকোনাতেই বুঝি চালের দাম সর্বোচ্চ। এখন দেখি রাজধানী ঢাকাকে কেহ 'ডাউন' দিতে পারে নাই। এই রেসে ঢাকাই ফাস্ট, নেত্রকোনা রানার্স আপ। ইত্তেফাকের খবর অনুযায়ী গত শনিবারে ঢাকার কোন কোন বাজারে আউশ, ইরি ও বোরো চালের দাম নয় টাকা সের উঠিযাছে। আর আটার সের ছয় টাকা– মানে মণ করা যথাক্রমে তিনশ ষাট ও দুইশত চল্লিশ টাকা।....এখন আর সপ্তাহে সপ্তাহে নয়, দিনে দিনে এমনকি ঘন্টায় ঘন্টায় অবস্থা বদলাইতেছে।...."

বলাবাহুল্য, আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতাগ্রহণ করে তখন প্রতিমণ চালের দাম ছিল ৩০ টাকা এবং প্রতি মণ গম পাওয়া যেত ১০ থেকে ১২ টাকায়।

১৮ ভাদ্র, ১৩৮১ বাংলা, ইত্তেফাক "দাও ফিরে সে অরণ্য" শর্ষিক সম্পাদকীয় স্তম্ভে আক্ষেপ করে বলেছে, "প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ছে। নিত্যদিন বেড়ে চলেছে, এ তথ্য খবরের কাগজ পাঠে যতটা জানা যায়, বাজারে গেলে অনুভব করা যায় ঢের বেশি। মনে হয় আগুনের হুল্কা যেন চামড়া ভেদ করে হৃৎপিণ্ড ছাই করে ফেলছে। সদাশয় সরকার বাহাদুর এর মোকাবেলায় হাম্বিতাম্বি মেলাই করছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যতই তাম্বি করছেন তাম্বুরা ততই কেটে যাবার উপক্রম করছে জিনিসপত্রের দাম-দরের লাফ-ঝাঁপে।..... আজকের দিনে কোনও খাঁটি জিনিস ও খাঁটি মানুষ পাওয়া খুবই দুষ্কর। ফল হচ্ছে উত্তরোত্তর জীবন-যন্ত্রণা বৃদ্ধি। এ যন্ত্রণা করে শেষ হবে জানি না। তবে দিন যত যাচ্ছে জীবন তত দুর্বিষহ হচ্ছে। বোধ হচ্ছে দুঃখনিশি পাড়ি দিয়ে আনন্দ প্রভাতে উঠে। আসার আশা যেন নিছক দূরাশা মাত্র।"

অক্টোবর ৮, ১৯৭৪ সালে ইত্তেফাকের মঞ্চে নেপথ্য উপসম্পাদকীয় নিবন্ধের আরেকটি মন্তব্য দেখুন, "পাশ্চাত্য দেশে বিউটি কম্পিটিশন হইয়া থাকে। বিশ্ব সুন্দরীদের নগ্ন প্রায় চিত্র প্রায়ই কাগজে বাহির হয়। জীবন্ত মনুষ্য কঙ্কালের যদি একটা বিশ্ব প্রদর্শনী হইত তবে আমি নিশ্চিত বলিতে

পারি এবার আমরাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিতে পারিতাম। সংবাদপত্রে এসব সচল মনুষ্য কঙ্কালের ছবি প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু কাগজের অফিসে যত ছবি আসে তার কয়টাই বা প্রকাশ করা যায়।.... ঈদ উপলক্ষে দিন দশেক জামালপুরের মফস্বল এলাকায় ঘুরিয়া ঐ রূপ কত দৃশ্য দেখিলাম। পঞ্চাশের মন্বন্তরেও অবশ্য বহু মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এবারের দৃশ্য আরো বীভৎস আরো বিরাট আরো বর্ণনাতীত। এই কলামে কিছু দিন আগে অনাহার ক্লিষ্ট কঙ্কালসার বায়াফ্রা শিশুর একটি ছবির কথা লিখিযাছিলাম- জাতিসংঘ সদর দফতরের সম্মুখে পথিপার্শ্বে টাঙ্গানো যে বিরাটাকৃতি ছবিটি বিশ্ববিকেকে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। আমিও ১৯৬৮ সালে এই চিত্রটি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু এবার আমি মফস্বল সফরকালে অমন কত শত শত জীবন্ত শিশু কঙ্কাল দেখিয়া আসিলাম তার সংখ্যা বলার সাধ্য আমার নেই। সেপ্টেম্বরে যাহা দেখিয়াছিলাম অক্টোবরে দেখিলাম তার দশগুণ। নবেম্বরে অবস্থা কি দাঁড়াইবে আল্লাহ মালুম। এই মর্মান্তিক অবস্থা আরো কতদিন চলিবে তাহাও আলেমুল গায়েবই জানেন।...."

লন্ডন থেকে প্রকাশিত নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর জনাথন ডিম্বলবি 'বাংলাদেশ ট্রাজেডি' শীর্ষক এক নিবন্ধে লিখেছেন, "এমন একদিন ছিল যখন শেখ মুজিব ঢাকার রাস্তায় বেরুলে জনসাধারণ হাত তুলে 'জয়বাংলা'– "বাংলাদেশের জয়" ধ্বনিতে মেতে উঠতো। আজ যখন স্বীয় বাসভবন থেকে তিনি অফিসের দিকে যান তখন দু'দিকে থাকে পুলিশের কড়া পাহারা। পথচারীরা সজ্ঞানে তার যাতায়াত উপেক্ষা করে।..... বাংলাদেশ আজ বিপজ্জনকভাবে অরাজকতার মুখোমুখি। লাখ লাখ লোক ক্ষুধার্ত হাজার হাজার মানুষ অনাহারে আছে। অনেকে না খেতে পেরে মারা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ আজ দেউলিয়া। গত আঠার মাসে চালের দাম চরগুণ বেড়েছে। সরকারী কর্মচারীদের মাইনের সবটুকুই চলে যায় খাদ্যসামগ্রী কিনতে, আর গরীবরা থাকে অনাহারে। কিন্তু যতই বিপদ ঘনিয়ে আসছে শেখ মুজিব ততই মনগড়া জগতে আশ্রয় নিচ্ছেন, ভাবছেন দেশের লোক এখনো তাকে ভালোবাসে। –সমস্ত মুসিবতের জন্য পাকিস্তানই দায়ী– আর বাইরের দুনিয়ায় তার সাহায্যের জন্য এখনো এগিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশ উদ্ধার পাবে। নিছক দিবাস্বপ্ন।"

হাঁ এই দিবাস্বপ্ন এবং সর্বক্ষণ চামচা বেষ্টিত থাকায় ব্যধি শেখ মুজিবকে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে দেয়নি। এ অবস্থায় তিনি ধ্বংস হয়েছেন, দেশকে ধ্বংস করেছেন। জেকুইস লেসলি, অক্টোবর ২, ১৯৭৪ সালে গার্ডিয়ান পত্রিকায়। "অন্তিম দশায় একদিন", ডানিয়েল সাদারল্যান্ড একই বছরের ১৮ অক্টোবর ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর পত্রিকায় "এই কি আজাদী" লরেন্স লিফ সুল্জ ২৫ অক্টোবর ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ পত্রিকায় "দুঃখ ও দৈন্য ফনা তুলছে" প্রভৃতি শিরোনামে শেখ মুজিবের ব্যর্থতা ও তার দলের দুর্নীতির বিবরণী তুলে ধরেছেন। ঐ সময়ে বিদেশী পত্র-পত্রিকাগুলোতে প্রায় প্রত্যহ বাংলাদেশ সংবাদ শিরোনাম হিসেবে স্থান পেতো একটা ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র এবং দুর্নীতির আখড়া হিসেবে।

শেখ মুজিবের করুণ পরিণতির পরও দীর্ঘদিন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তার ভূমিকা, ব্যর্থতা ও সার্বিক যোগ্যতা নিয়ে অনেক প্রতিবেদন এবং বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালের ২৯শে আগস্ট হংকং থেকে প্রকাশিত ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ পত্রিকার "শেখের ট্রাজেডি" শিরোনামে হার্ভে স্টকউইনের একটি নিবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই। এতে তিনি বলেছেন, "বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায়ই যে প্রলঙ্ককরী ঘূর্ণিবার্তা বাংলাদেশের উপর আসে শেখ মুজিব ছিলেন তারই মানবীয় রূপ, রাজনৈতিক মঞ্চে তার দীপ্ত পদচারণার সাথে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও আবেগের উচ্ছ্বাসে সবকিছু তলিয়ে গেল। আজ মুজিব মঞ্চ থেকে চিরকালের মত সরে গেছেন, কিন্তু দেশকে রেখে গেছেন রিক্ত নিঃসহায় করে। তার আমলে কি ক্ষতিসাধিত হয়েছে তার চূড়ান্ত হিসাব কেবল এখনি শুরু হতে পারে।"

হ্যাঁ মুজিব ও তার দল লুটপাট, খুন, রাহাজানি, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে দেশের যে ক্ষতি করে গেছেন তার জের আজো আমরা টানছি। এ ক্ষতি অপূরণীয়। সম্ভবত এ কারণেই তার পতন সারাদেশের আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল।

নিবন্ধের শুরুতে তোরাবগঞ্জে ভারতীয় বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার ভূপাতিত হবার ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম, এই হেলিকপ্টারে কারা ছিলেন তাতে কি ছিল? নিহত কর্মকর্তাদের মরদেহ পরদিন আরেকটি হেলিকপ্টারে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়ে ছিল। কিন্তু তাদের সাথে যে দলিল ছিল সে সম্পর্কে অদ্যাবধি কোনও সরকার মুখ খোলেননি। জোট সরকার কি এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করতে পারে না।

কথায় কথায় হরতাল আর কত দিন?

-জিবলু রহমান

পূর্ণদিবস হরতাল। অর্থ দিবস হরতাল। সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। লাগাতার হরতাল ৪৮, ৭২ কিংবা ৯৬ ঘন্টা ছাড়িয়ে যায় হরতালের সীমারেখা। হরতাল কালচার অবশ্য অনেক পুরনো কিন্তু কারণে ও অকারণে হরতাল ডাকায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হরতাল এখন খেটে খাওয়া মানুষের জন্যে বয়ে আনে অভিশাপ। মুমূর্ষু রোগী পৌঁছতে পারে না হাসপাতালে। রফতানি পণ্যের ট্রাক পড়ে আটকে। পথচারীর মাথায় বিস্ফোরিত হয় ককটেল। স্থবির হয়ে পড়ে অর্থনীতি। জিম্মি হয় জনগণ। বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চায় হরতাল এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে উঠেছে। তখন রোমের সুশাসন আর মেধাবী সভ্যতার সূর্য ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে অনেকখানি। খ্রিস্টপূর্ব '৭১ সাল। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগের কথা। রোমে এক বাৎসরিক উৎসবে হিংস্র সিংহের খাঁচায় লড়তে হতো অসহায় দাসদের। খালি হাতে নিশ্চিত মৃত্যু আর পশু-মানুষের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই বিনোদনের খোরাক হতো রোমের উচ্চবংশীয় শাসককুলের। এই অসহায় যোদ্ধাদের বলা হতো গ্ল্যাডিয়েটর। হরতাল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু নতুন শতাব্দির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মানুষ এক অসহানীয় অবস্থার বিরুদ্ধে লড়েছে। জনগণ নিরস্ত্র অসহায়। গ্ল্যাডিয়েটর এর ভূমিকা এখন বাংলাদেশের মানুষ। হরতাল নামক অসহনীয় রাজনৈতিক অস্ত্রের মুখোমুখি বাংলাদেশ। থমকে দাঁড়াচ্ছে

উপ-সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বন্ধ থাকছে স্কুল। অফিস-বাজার। আর আছে গুপ্তহত্যার রিরংসা। হাত উড়ে যাচ্ছে নিরীহ রিকশাওয়ালার। পথচারীর মাথায় পড়ছে ককটেল। এক সময়ের শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র হরতাল এখন এক বিভীষিকার নাম। দল-মতের স্বাধীনতা প্রকাশের এই মাধ্যমটি এখন আমাদের উপহার দেয় গুলী, বোমা, জ্বালাও-পোড়াও, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর লাশ।

প্রচলিত হরতাল কী তার গণতান্ত্রিক ধর্ম অক্ষুণ্ন রেখেছে? হরতালের কি কোনো বিকল্প নেই? গুজরাটি শব্দ 'হরতাল' স্থান নিয়েছে অক্সফোর্ড ডিকসোনারিতে। আভিধানিক অর্থে 'হরতাল' হলো বিক্ষোভ প্রকাশার্থে দোকান-হাট, কাজকর্ম প্রভৃতি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা। এই আভিধানিক অর্থই স্পষ্ট যে হরতাল হলো স্বেচ্ছায় পালন করার বিষয়। নিজের কাজকর্ম বন্ধ । সেটা হতে পারে নিজের দোকান বন্ধ রাখা, নিজের গাড়ী বা যানবাহন বন্ধ রাখা ইত্যাদি। কারো উপর জবরদস্তি করার বিষয় নয়। অর্থাৎ হরতাল যারা আহ্বান করবেন তারা নিজেরা নিজেদের কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবেন, নিজেদের দোকান বন্ধ রাখবেন। নিজেদের যানবাহন বন্ধ রাখবেন। তারা আহ্বান জানাতে পারে সবাইকে হরতাল পালন করতে বা কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য। কিন্তু জোর-জবরদস্তি করতে পারবে না। আভিধানিক অর্থের সাথে হরতালের প্রায়োগিক দিকের কোন মিল পাওয়া যাচ্ছে না ইদানীং।

বাংলাদেশের হরতালকেই বিদেশী বিনিয়োগকারী মনে করেন বড় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার নজির হিসেবে। এ কারণেই কি দেশের মানুষের কথা মাথায় না রেখে ক্ষমতায় যাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকেই হরতাল আমাদের নির্ধারিত নিয়তি। পাকিস্তান শাসন আমলের ২৫ বছরে হরতাল হয়েছিল মাত্র ১৪ দিন। সেই হরতাল ছিল একটি জাতির জন্মের আন্দোলনের হাতিয়ার। সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের এক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের আমলে হরতাল হয়েছিল ৯ দিন। এসব হরতাল ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। খুব ভোর থেকে পিকেটাররা রাস্তায় অবস্থান গ্রহণ করতো। দিনের আলো ফুটে ওঠার পরই পিকেটারদের সাথে যোগ দিতো সর্বস্তরের মানুষ। হরতাল পালনের জন্য তেমন কোনো জবরদস্তি করতে হতো না। হরতাল ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক কর্মীরা ব্যাপক জনসংযোগ চালাতেন। সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হতো হরতাল পালনের জন্য। তখন সত্যি সত্যিই হরতাল ছিল সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশের একটি সরব ঘটনা।

১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ছাত্ররা প্রথম হরতাল আহবান করে। ১৯৬৬ এবং ১৯৬৯ বাংলাদেশে হরতাল পালিত হয়েছিল একাধিক। স্বতঃস্ফূর্ত সেই হরতালের মাত্রা ছিল ভিন্ন। জনমনে কোন বিরক্তি তৈরি করেনি সেই হরতাল। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্তে মার্চ মাসে হরতাল হয়েছিল ৫ দিন। পার্লামেন্টের অধিবেশন হঠাৎ স্থগিত করার প্রতিবাদে ২ মার্চ ১৯৭১ হরতাল পালিত হয়েছিল ঢাকায়। ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ মোট ৪ দিন হরতাল পালিত হয় ১৯৭১ সালে।

মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে ১৯৭১-এর মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমান হরতাল কর্মসূচীর সময় ট্রেন, বাস, ঠেলাগাড়ি, রিকশা ও অন্যান্য যানবাহন, পানি ও বিদ্যুতের সরবরাহ বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই দিনগুলো হরতালের প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে, একটি জাতির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। আর বাংলাদেশে? হরতাল এখন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে বিঘ্ন করার এক প্রয়াস। 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ সত্যের উদ্বোধন'-এই মন্ত্রে হরতাল -এর সাফল্যের নজির দেখিয়াছিলেন মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারত ছাড় আন্দোলনেই নয় দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্রমিকদের নিয়ে প্রবাসী জীবনে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আন্দোলন। চেয়েছিলেন মানবতার মুক্তি। হরতাল ছিল সত্যাগ্রহের অস্ত্র। আর গত এক দশকে গুজরাটি শব্দ 'হরতাল' বাংলাদেশের জন্য এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে উঠেছে।

আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে ১৫ জুলাই পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল। এই ৫ বছরে সরকারের অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক, দেশবিরোধী, স্বেচ্ছাচারী ও নিবর্তনমূলক কার্যক্রমের প্রতিবাদে হরতাল হয়েছে। চারদলীয় জোটের আহ্বানে হরতাল হয়েছে আওয়ামী লীগের শেষ দুই বছরে। আর তার আগের ৩ বছর যা দু'চারটি হরতাল হয়েছে তা মূলত বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটের যুগপৎ আহ্বানে পালিত হয়েছে। এসব হরতালে দেখা গেছে হরতাল আহ্বানকারীরা হরতাল ডেকে আওয়ামী ভাষ্য অনুযায়ী, নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের অফিসে বসে থাকছে। এ নিয়ে বিএনপিসহ চারদলীয় জোটকে অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছে। বিশেষ করে মাঠের নেতা যারা তাদেরকে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করা হয়। সংবাদপত্রগুলো পর্যন্তও জোটের নেতৃবৃন্দকে সমালোচনা করে এই বলে যে, 'হরতাল ডেকে বিএনপির নেতারা ঘরে ঘুমিয়ে থাকে।' এমনকি আওয়ামী লীগের নেতারা তখন বিদ্রূপ করে বলেছেন, 'বিএনপি-জামায়াত হরতাল ডেকে ঘরে শুয়ে থাকে আর মাঠে থাকে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ।' বাস্তবেও তাই দেখা গেছে যে, আওয়ামী লীগ আমলে হরতাল আহ্বানকারী যতজন রাস্তায় থেকেছে, পিকেটিং করেছে তার চেয়ে বেশী আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীরা পথে থেকেছে বেশী। বড় বড় মিছিল করেছে তারাই। প্রতিটি থানা ওয়ার্ড থেকে পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গ সংগঠনসমূহ মিছিল বের করেছে হরতালের বিপক্ষে।

অতীত নিয়ে একটু আলোচনা করি। ১৯৯১-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন হরতালের রেকর্ড আছে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের আমলে তিনি ১৭৩ টি হরতাল পালন করেছিলেন। এবার বোধ হয় তিনি তার অতীত রেকর্ড ভাঙ্গতে চান। ভালো কাজে রেকর্ড গড়ার কৃতিত্ব সর্বদাই প্রশংসনীয়, কিন্তু মন্দ কাজে যে কাজ মানুষকে অযথা কষ্ট দেয়, জনজীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি দেশ ও জাতির ক্ষতি সাধন করে তা শুধু নিন্দনীয়ই নয়, জনগণ কর্তৃক প্রতিরোধযোগ্যও বটে। হরতাল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি সবল হাতিয়ার, তবে দেশে দেশে এ প্রক্রিয়াটির প্রয়োগ হয় আন্দোলনের নানা স্তর পেরিয়ে সর্বশেষে। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং তার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আবরণে এ অস্ত্রটির যথেচ্ছ ব্যবহার করে চলেছেন। হিংসা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগকৃত তার হরতাল-অস্ত্র এখন আঘাত করছে গোটা দেশ ও জাতিকে।

উপ-সম্পাদকীয়

খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের আমলেও জ্বালিয়েছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু মেয়াদপূর্তির আগে সরকারের আসন টলাতে পারেনি তারা। এই পালাও হরতাল-অবরোধ দিয়ে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মেয়াদপূর্তির আগে বিপুলভাবে গণসমর্থিত জোট সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে পারবে বলে মনে হয় না। আওয়ামী লীগের উচিত সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতির সুশীল ধারায় ফিরে আসা। সরকারেরও উচিত অসহিষ্ণু না হয়ে সকলের প্রতি গণতান্ত্রিক আচরণ করা। আওয়ামী লীগের সাংবিধানিক গণনির্বাচিত সরকারকে 'উৎখাত করবো' 'গলা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো'- এসব উচ্চারণ যেমন ফ্যাসিস্ট উচ্চারণ, একইভাবে ' হরতাল করতে দেবো না' সরকারের কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির এ ধরনের কথাবার্তাও গণতন্ত্রসম্মত নয়। আচরণে এবং উচ্চারণে সরকারকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা, বিরোধী দল ইস্যু তৈরী করতে চাচ্ছে, রাজপথে লাশ কামনা করছে। তাদের সে সুযোগ দেখা সমীচীন হবে না।

হরতাল নিয়ে শেখ হাসিনার বচন

২০-৩-১৯৯৭ ঃ হরতালের নামে বিদ্যুৎ গ্রীড ভেঙ্গে ওরা নাশকতামূলক কাজ করছে ॥ শেখ হাসিনা

১৭-২-১৯৯৮ ঃ ওরা হরতাল করতেই থাক। আমরা এমপিদে ভাগিয়ে এনে মন্ত্রিত্বে বসিয়ে চমক দেখাতেই থাকবো ॥ শেখ হাসিনা (বিএনপির এমপি হাসিবুর রহমান স্বপন ও আলাউদ্দিনকে ভাগিয়ে এনে মন্ত্রী করার সময়)

৫-১১-১৯৯৮ ঃ এখন দেশে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার দেশ পরিচালনা করছে। এতে করে জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি আদায় হয়েছে। এখন আর কোনো হরতালের প্রয়োজন নেই ॥ শেখ হাসিনা

১৪-১১-১৯৯৮ঃ ৭ নভেম্বর আবার কিসের হরতাল ? হরতাল নিয়ে দেখি ছেলেখেলা শুরু হয়েছে ॥ শেখ হাসিনা

১৫-১১-১৯৯৮ ঃ আওয়ামী লীগ আর কোনো দিন হরতাল করবে না ॥ শেখ হাসিনা (দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে মতবিনিময়কালে)

১৩-১২-১৯৯৮ ঃ আজকের দিনে বিএনপি কেন হরতাল দিল, তারা কি দেশের উন্নয়ন চায় না? (ধলেশ্বরী সেতু উদ্বোধনের সময় শেখ হাসিনা)

১৩-৪-১৯৯৯ ঃ হাইকোর্টও হরতালের বিপক্ষে ॥ শেখ হাসিনা (হরতাল কেন বেআইনী হবে না হাইকোর্টের কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি প্রসঙ্গে)

২৯-৯-১৯৯৯ ঃ অফিসের কর্মদিবসে হরতাল ডাকলে সেদিন ছুটি ঘোষিত হবে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিন অফিস খোলা থাকবে ॥ শেখ হাসিনা

৩১-১১-১৯৯৯ ঃ হরতাল পরিবেশের জন্য ভাল। হরতালের দিন গাড়ীর কালো ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ হয় না ॥ শেখ হাসিনা (গামেন্টস মালিকদের সভায়)

৮-১১-১৯৯৯ ঃ মুক্তিযোদ্ধারা আরেকবার একত্রিত হলেই হরতাল আহবানকারী রাজাকারেরা পরাজিত হবেই ॥ পল্টন ময়দানে শেখ হাসিনা

২৬-৪-২০০০ ঃ মিগ কেনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করুন। তা না হলে হরতালকারীদের ক্ষমা চাইতে হবে ॥ শেখ হাসিনা

৮-৮-২০০০ ঃ আমরা হরতাল সমর্থন করি না। আমরা আর কোনদিন হরতাল করবো না। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে গেলেও কোনদিন হরতাল করবে না ॥ জাতীয় সংসদে শেখ হাসিনা

৩০-৮-২০০০ ঃ ওরা কেন ঘন ঘন হরতাল বুঝতে পারছি না। আর কয়টা দিন অপেক্ষা করলে কি হয়? আমি তো বলেছি আমরা বিরোধী দলে গেলেও হরতাল করবো না। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি জনগণের সামনে ঘোষণা দিচ্ছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে গেলেও কোনদিন হরতাল করবে না॥ পল্টনের সমাবেশে শেখ হাসিনা। (চলবে)